১) সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

- সাম্প্রতিককালের জনৈক গবেষক কে. সুরেশ সিং মন্তব্য করেছেন—ভারতীয় কৃষক সহ অন্যান্য যে কোনো গোষ্ঠীর থেকে অনেক বেশি জঙ্গি ও হিংস্র বিদ্রোহে সামিল হয়েছিলেন ভারতের উপজাতিরা। ব্রিটিশ বিরোধী গণ সংগ্রামে উপজাতিদের একটি গৌরবময় ভূমিকা ছিল। এই উপজাতি বিদ্রোহগুলির মধ্যে ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল উপজাতীয় সামাজিক সংহতি এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদে আঞ্চলিকতার চেতনার সংগ্রামী বহিঃপ্রকাশ।

  অন্যান্য উপজাতিদের মতোই সাঁওতালরাও ছিলেন ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নিজেদের শ্রম ও প্রচেষ্টায় সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও উর্বর করে তুলেছিলেন। এই অঞ্চলকে বলা হত "দামিন-ই-কোহ্"। কিন্তু অচিরেই বহিরাগতরা এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে সাঁওতালরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন। বহিরাগতদের সাঁওতালরা বলতেন ''দিখু'' বা বিদেশি। ''দিখু''-দের মধ্যে ইংরেজরা এবং ভারতীয় বণিক ও মহাজনরা পড়তেম। ইংরেজরা "দামিন-ই-কোহ্"-এর জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছিলেন। এবং অসদুপায় অবলম্বন করে তাদের জমিজমা দখল করে নিতেন। উভয়ের কার্যকলাপই সাঁওতালদের অর্থনৈতিক স্বার্থ আঘাত করেছিল। ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর ''The Santal Insurrection of 1855-57" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, মহাজনেরা সাঁওতালদের সামান্য পরিমাণ টাকা ও কিছু চাল ধার হিসাবে দিতেন। তারপর তাঁরা ধূর্ত ও উৎপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দরিদ্র সাঁওতালদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা হয়ে বসতেন। অধমর্ণ সাঁওতালদের মহাজনেরা তারপর সারাজীবন ধরে নিয়ন্ত্রণ করতেন। Bradley-Birt তাঁর "Story of an Indian Upland" গ্রন্থে বলেছেন সাঁওতালদের মহাজনেরা ক্রীতদাসের স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন এবং মহাজনী শোষণ সরকারি আদালতগুলির পূর্ণ সমর্থন ও অনুমোদন পেয়েছিল।

  ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর ''সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন—বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান থেকে মহাজনদের সঙ্গে অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীও এসেছিলেন। তাঁরা সাঁওতালদের থেকে সস্তাদরে ফসল কিনে চড়াদামে বাইরে চালান দিতেন এবং বাইরে থেকে নুন, তেল প্রভৃতি পণ্য এনে সাঁওতালদের কাছে তা চড়াদামে বিক্রি করতেন। সাঁওতালদের সঙ্গে ক্রয় বিক্রয় করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা তাঁদের প্রতারিত করতেন এবং সাঁওতালদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের ওজনে ঠকাতেন। ১৮৫০-এরর দশক নাগাদ দেখা গেল সাঁওতালদের উৎপন্ন ফসলের প্রায় সবটুকুই ইংরেজ বণিকদের কুঠিতে বা ব্যবসায়ি মহাজনদের গুদামে জমা হচ্ছে। ইংরেজদের জঙ্গল কাটা ও মহাজন-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও প্রবঞ্চনা সাঁওতালদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সরকারি রাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। এই শোষণক্লিষ্ট দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খায় সাঁওতালরা ১৮৫৫ সাল নাগাদ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন।

  সাঁওতাল গণসংগ্রামের প্রেক্ষাপট হিসাবে ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি ডাকাতি ১৮৫৪ সাল নাগাদ। অধিকাংশ ডাকাতির ঘটনাই ঘটেছিল বাঙালী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। যেসব বাঙালি মহাজন ও ব্যবসায়িরা সাঁওতালদের সবথেকে আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, ১৮৫৪ সালে সাঁওতাল ডাকাতদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল তারাই। রণজিৎ গুহর মতে কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ডাকাতিগুলি ছিল ধনী শোষকদের লুন্ঠন করে অনাহারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার বেপরোয়া প্রয়াস। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Eric Hobsbwam বলেছেন বিশ্বের বিভিন্ন

অভ্যুত্থানে শোষিত মানুষের প্রতিবাদের আদিম অভিব্যাক্তি (primitive form of protest) হিসাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। দরিদ্র সাঁওতালদের ডাকাতির ঘটনাও এর ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু কোম্পানী সরকারের আইন সাঁওতালদের এই ,অপরাধ'কে ক্ষমার চোখে দেখেননি। সাঁওতালদের ডাকাতির অপরাধে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। প্রায় একবছর পর ১৮৫৫ সালে জুলাই মাসে সাঁওতালরা তাদের সংগঠন ''হুল'' গঠন করেন। ''হুল'' ছিল তাঁদের তীব্র প্রতিরোধস্পীহার ফসল। এইভাবে ডাকাতি ও হামলার মধ্যে দিয়ে যে প্রিবাদের সূত্রপাত, তা ১৮৫৫ সালের জুন-জুলাই মাসে একটি সংগঠিত অভ্যুত্থানের রুপ নেয়। এই অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল সিধু ও কানু দুই ভাই। সিধু ও কানু ঘোষণা করলেন যে সাঁওতালদের ''ঠাকুর'' তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন দারোগা ও মহাজনদের খুন কর, তাহলে ন্যায়বিচার পাবে"। গোটা সাওতাল সমাজ সিধু, কানুর ঘোষণাকে সত্য বলে মনে করেন এবং তাঁরা একে তাঁদের মুক্তির জন্য অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং বিদ্রোহের সূচনা ও বিস্তারে এই ঘটনার গুরুত্ব অসামান্য।

দেখতে দেখতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ভাগলপুর, সিংভূম, মুঙ্গের, হাজারিবাগ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার একাংশ বিদ্রোহ কবলিত অঞ্চলে পরিণত হয়। বিদ্রোহীরা লক্ষ্মীপুর, লিটিপুরা, হিরনপুর, মানসিংপুর প্রভৃতি এলাকার বাজার অঞ্চলে ব্যাপক লুন্ঠন চালায়। ভৈরব ও চাদের নেতৃত্বাধীন একদল বিদ্রোহী পাকুড়ের রাজবাড়ি আক্রমণ করে সর্বস্ব লুন্ঠন করেন। এই সময় অন্যান্য জাতির দরিদ্র মানুষরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুর্ণ সহযোগীতা করেছিলেন। সমসাময়িক সরকারি নথিপত্র থেকে জানা যায় যে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বাংলোগুলি আক্রমন করেছিল এবং নীলকর সাহেব, রেলের ইউরোপীয় কর্মচারী এবং পুলিশ পদাধিকারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন।

সাঁওতালরা যে সম্পত্তি লুন্ঠন করতেন, সেগুলি তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। উইলিয়াম হান্টার সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন—অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন সাঁওতালরা হিন্দু মহাজন-ব্যবসায়ীদের প্রতারনার শিকার হতে অস্বীকার করেছিলেন, দরিদ্র কৃষিজীবী সাঁওতালরা হিন্দুদের ভুমিদাসে পরিণত হতে এবং সাঁওতাল দিনমজুরেরা তাঁদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে অস্বীকার করেছিলেন। এই অস্বীকার করার প্রবণতাই তাঁদের বিদ্রোহী করেছিল। রাজমহল থেকে কোলগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ও বীরভূম ও ভাগলপুরে সাঁওতালবাহিনী তাঁদের সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা তাঁদের প্রতিরোধ সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে পারেননি। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ সরকার সামরিক বাহিনী নিয়োগ করে। সাঁওতালদের সংগঠন যথেষ্ঠ দৃঢ় ছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। কঠোর হাতে রাষ্ট্র এই বিদ্রহ দমন করে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাতে গিয়ে সিধু গ্রেপ্তার বরন করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কানুকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং ফাসি দেওয়া হয়। এইভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহান নেতার জীবনাবসান হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল উনিশ শতকের ভারতবর্ষের গনসংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অথচ দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।

২) সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সরকারি নথিপত্র ও প্রতিবেদনে এবং তার উপর ভিত্তি করে রচিত বিভিন্ন লেখায় বিদ্রোহীদের 'ডাকাত' বা 'দুষ্কৃতিকারী বলে চিহ্নিত করা হলেও, দীর্ঘস্থায়ী এই বিদ্রোহে(১৭৬৩-১৮০০) প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ। এই বিদ্রোহ নিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "Memoirs of Warren Hastings"-এ G.R.Gleig এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, নবাবী আমল থেকে ব্রিটিশ শাসনের উত্তরনের পথে এই বিদ্রোহে সন্ন্যাসীরা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পরে W.W.Hunter এই বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। বিগত শতকের তৃতীয় দশকে রায়বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Sannyasi and Fakir Raider in Bengal"- এ বিদ্রোহীদের দস্যু ও শান্তভঙ্গকারী হিসাবে নিন্দা করেছেন। অধ্যাপক নিরোদভূষণ রায় ও যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন যে, আসলে ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল শাহজাদা আলি গোউহর, পরবর্তীকালের মুঘল বাদশাহ শাহ আলমের ভাড়াটে সৈনিক এবং আলি গৌহর যখন বারবার বাংলা আক্রমন করেন তখন তাঁরা তাকে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে সরকারী ইতিহাস ও গেজেটিয়ার রচয়িতা L.S.S.O.Mailly-এর মতে বিদ্রোহীরা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সৈনিক ও সর্বস্বান্ত চাষী।

  ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র এই প্রতিবাদী আন্দোলন ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হিসাবে অভিহিত হবার কারণ এই বিদ্রোহে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা। ওয়ারেন হেস্টিংসই এই বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নাম দিয়েছিলেন। তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। সন্ন্যাসীরা ছিলেন বৈদান্তিক হিন্দু যোগী। ফকিররা ছিল সুফি সম্প্রদায়ের মাদারিয়া শ্রেণী। অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক অবক্ষয় ও ভাঙনের ফলে যে অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার ফলে নিম্নশ্রেণির বহু মানুষ ও অনেক ভাড়াটে সৈনিক সন্ন্যাসী ফকিরদের দলে যোগদান করেন। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় সন্ন্যাসীরা জমিদারদের কাছ থেকে নিষ্কর জমি লাভ করেছিল। জমি ছাড়াও তাদের আয়ের অপর এক উৎস ছিল মহাজনি ব্যবসা। তারা জমিদার ও সাধারণ কৃষক—উভয়কেই টাকা ধার দিত। এভাবেই সন্ন্যাসীরা গ্রামবাংলার জীবনের অংশিদার হয়ে গিয়েছিল। ফকিররা অবশ্য ভূসম্পত্তির মালিক ছিল না বা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত না। এদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র কৃষক এবং অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবনযাপন করত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে অবশ্য কেউ কেউ নিষ্কর জমি উপভোগ করত।

  ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানি লাভের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনে তার ফলে নতুন এক জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, জমি স্মপর্কে যাদের কোন বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল না। এই জমিদারদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের বিরোধ বাঁধে। কারণ কোম্পানীর রাজস্ব মেটাতে এই নব্য জমিদাররা প্রায়ই সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে টাকা ধার করত এবং সুদের হার, কীভাবে টাকা শোধ হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিরোধ বাঁধত। তারা প্রায়ই ঋণ শোধ করতে না পেরে কোম্পানীর সাহায্যপ্রার্থী হত। ইংরেজরা এই বিরোধে জমিদারদের পক্ষই নিত। এর ফলে সন্ন্যাসীরা কোম্পানীর শাসনে ক্ষুব্ধ হয়। অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিপননের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিয়াকার স্থাপনের চেষ্টাও সন্ন্যাসীদের স্বার্থে আঘাত করে। উপরন্তু সন্ন্যাসী ও ফকির—উভয়েরই তীর্থযাত্রা ও ধর্মীয় স্থানে পরিভ্রমণের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইংরেজদের সন্দেহ হয় যে,

সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা এইসব তীর্থক্ষেত্র ব্যবহার করত তাদের শলাপরামর্শ ও অর্থশাস্ত্র বন্টনের কেন্দ্র হিসাবে।

কেবলমাত্র ফকির-সন্ন্যাসীদের অভাব অভিযোগ ও ক্ষোভ এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেনি। ব্রিটিশ শাসনের প্রাককালে বাংলায় যে সার্বিক অবক্ষয় ও পতন দেখা গিয়েছিল, বিদ্রোহের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে তার মধ্যেই। সাধারন কৃষক ও কারিগরেরা ইংরেজ শাসনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ন্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কোম্পানীর ভূমিরাজস্ব ও বাণিজ্য নীতি কৃষক ও কারিগরদের বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়। তাঁরা জমিজমা ছেড়ে পালানোর পরিবর্তে প্রতিবাদের বিকল্প পথ অনুসন্ধান করতে থাকে। ড. অতীশ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, তারা ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেই এই পথ খুজে পায়। সম্পত্তিচ্যুত সাবেকি জমিদার ও বেকার সৈন্যরাও এই একই কারণে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। একথা ঠিক যে, সন্ন্যাসীরা প্রায়ই কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। কিন্তু তার পেছনে ধর্মের সমর্থন ছিল। তবে তারা সচরাচর কৃষকদের অত্যাচার করত না। সাধারণভাবে তারা অত্যাচারী জমিদারদের কাছারি, সম্পন্ন কৃষকদের গোলা ও সরকারী রাজস্ব লুট করত। কোম্পানীর শাসনের অত্যাচার ও নিপীড়ন দূর করাই ছিল তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

সন্ন্যাসী-ফকিরদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ১৭৬১ খ্রিঃ। তারা সাবেকি জমিদারদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ শুরু হয় বর্ধমান ও বীরভুমে। কিন্তু এই বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুচবিহার, বগুড়া, মালদা, ময়মনসিং, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ণিয়া। ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সাধারনভাবে কৃষকরা প্রথমে এই বিদ্রোহে সামিল হয়নি। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তারা সক্রিয়ভাবে এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে। জমিদাররাও কোম্পানীর উপর ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ছিল। মন্বন্তর ও তৎপরবর্তী পর্বে বিদ্রোহীরা নব নিযুক্ত জমিদারদের কাছারি এবং কোম্পানীর রাজস্ব ও কুঠিতে লুঠতারাজ ও ডাকাতি শুরু করে।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। ১৭৮৭ সালে মজনুশাহের মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলি শাহ ও পারগল শাহ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। দেবী চৌধুরানী ছিলেন বিদ্রোহের আর একজন উল্লেখযোগ্য নেত্রী। অন্য একজন নেতা হলেন গণেশ গিরি। নেতৃত্বের প্রশ্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, বিদ্রোহের প্রাথমিক পররেবে নেতৃত্বের প্রশ্ন গুরুত্বপুর্ণ ছিল না। সন্ন্যাসী ও ফকিররা যারা যেখানে শক্তিশালী ছিল তারা সেখানে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। জনগণের সক্রিয় সমর্থন তাদের প্রতি ছিল কারণ কোম্পানীর আমলে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে, তখন নেতারা অনেক সময় যৌথভাবে কাজ করত। ১৭৯০ সালের ময়মনসিং-এর কালেক্টরের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, চেরাগ আলি ও অন্যান্য ফকির মোহনগিরি ও অন্যান্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল। সন্ন্যাসীরা ফকিরদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করতে আপত্তি করেনি। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এই ঐক্যবোধের অভাব ও মতভেদ দেখা দেয়। তৃতীয়ত, সন্ন্যাসী ও ফকিররা এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকায় এই বিদ্রোহে ধর্মের একটি ভূমিকা ছিল। সন্ন্যাসী ও ফকিররা কৃষকদের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে ধর্মের প্রেরণা যুক্ত করেন। তবে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক ও কারিগর কতটা নিজ নিজ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল তা বলা কঠিন।

দীর্ঘস্থায়ী হলেও সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এই ব্যররথতা অস্বাভাবিক ছিল না। দক্ষ সংগঠন, যোগ্য নেতৃত্ব, সংগ্রামী অভিজ্ঞতা এবং সবার উপরে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে কোন প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক শর্ত। দুর্ভাগ্যবশত সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে এর সবকিছুরই অভাব ছিল। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য ও বোঝাপড়া থাকলেও সঠিক ও সংগঠিত পথে বিদ্রোহ পরিচালিত হয়নি। শেষ পর্যায়ে বোঝাপড়ার অভাবও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও বাংলার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই বিদ্রোহ ছিল কোম্পানীর অপশাসন ও জনবিরোধী নীতির প্রতি এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং বাংলার জনগ্ণ যে তাদের ঔপনিবেশিক শাসকদের চরিত্র বুঝতে ভুল করেনি, এই বিদ্রোহে তা প্রমাণিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রমাণ করেছিল অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন সম্ভব। একথা ঠিক যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়া শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল না এবং মতভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবু সামগ্রিকভাবে এক আদর্শগত ঐক্য উভয় সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের ফলে কোম্পানীর চরিত্র ও কৃষকবিরোধী নীতির কোনো পরিবির্তন হয়নি।

৩) চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

- চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৯-১৭৯৯ খ্রিঃ) হল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম বৃহৎ কৃষক বিদ্রোহ। চুয়াড় সম্প্রদায়ের মানুষরা জঙ্গলমহলে অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, সিংভূম, মানভূম ও ধলভূমের অধিবাসী। তারা কৃষিকার্য ও পশু শিকারের পাশাপাশি স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কাজ করত। বেতনের পরিবর্তে এদেরকে জায়গীর জমি দেওয়া হত। সেই জমিকে বলা হত "পাইকান জমি"। এই স্কল পাইক সৈন্য তীর, টাঙ্গী, বর্শা, বাঁটুল প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করত। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চুয়াড়রা ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তা চুয়াড় বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

  মেদিনীপুরের জমিদারদের উপর ইংরেজ কোম্পানী করের বোঝা বাড়িয়ে দেয়। এতদিন এই জমিদাররা মুঘল সরকারের ভূমিরাজস্ব আদায় করে দিত। মুঘল শাসনের শেষ ভাগে জঙ্গলমফলের এই জমিদারগণ স্বাধীনভাবেই বসবাস করত। কিন্তু ইংরেজরা তাদের এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে এবং ভূমিরাজস্বের পরিমাণ এরুপ বৃদ্ধি করে যে তা আদায় করা অত্যাচারী জমিদারগণের পক্ষেও অসাধ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পাইক সৈন্যরা এই বিদ্রোহে জমিদারদের পক্ষ নেয়। মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফটানান্ট ফার্গুসন একদল সৈন্যসহ জঙ্গলমহল অধিকার করতে আগমন করেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধের পর একে একে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শালদা প্রভৃতি মহলের জমিদারগণ কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন। ইংরেজ কোম্পানী আরও অগ্রসর হয়ে সিংভূম, মানভূম ও বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জমিদারগণকেও নতিস্বীকারে বাধ্য করেন। এইভাবে প্রথম পর্যায়ের চুয়াড় বিদ্রোহের অবসান হয়।

  কিন্তু ১৭৯৮-৯৯ খ্রিঃ বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও মেদিনীপুরের উওর-পশ্চিম এলাকা জুড়ে পুনরায় চুয়াড়রা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। চুয়াড়দের জমিজমা ইংরেজরা দখল করে

নিয়ে উচ্চমূল্যে নব্য জমিদার ও ইজারাদারদের বিক্রয় করলে এবং এই জমির উপর উচ্চহারে খাজনা ধার্য করলে এই চুয়ায়র সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চুয়াড়রা গৃহ, জমি ও জীবিকা হারিয়ে নিশ্চিত ধংসের মুখে পতিত হয়। এর অনিবার্য পরিণতি স্বরুপ বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার বিরাট অঞ্চল ব্যাপি এক ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই সময় ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নে ক্ষিপ্ত হয়ে অন্য এক শক্তি চুয়াড়দের সঙ্গে যোগদান করে চুয়াড়দের শক্তবৃদ্ধি করে। এই শক্তি হল ''পাইক'' নামক এক বিশেষ সম্প্রদায়। মুঘল আমলে পাইকরা সরকারী পুলিশের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই কার্যের জন্য তারা মুঘল সরকারের নিকট থেকে বিনা খাজনায় অথবা বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করত। কিন্তু ইংরেজ শাসনে এই সম্প্রদায় তাদের জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়। এর ফলে পাইকরা চুয়াড়দের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

চুয়াড় বিদ্রোহ প্রথম ব্যাপক আকার ধারণ করে মেদিনীপুর জেলার রায়পুর পরগণা থেকে। এই এলাকার জমিদার নির্দিষ্ট সময়ে ইংরেজ শাসকদের রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে ইংরেজরা তাঁর জমিদারী কেড়ে নেয়। দুর্জন সিংহ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিদ্রোহী পাইক ও চুয়াড়দের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্রোহীরা রায়পুর পরগণায় প্রবেশ করে নতুন জমিদারকে বিতাড়িত করে নিজেরাই রায়পুর অধিকার করে বসে। ১৭৯৮ খ্রিঃ মার্য মাসে দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে দেড় হাজার বিদ্রোহী চুয়াড় ও পাইক রায়পুর পরগণার ত্রিশটি গ্রামে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। জুন মাসে একটি বিদ্রোহী দল রামগড় পরগণায় প্রবেশ করে সকল ইংরেজপক্ষীয় জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের সম্পত্তি লুঠ করে। জুলাই মাসে গোবর্ধন দিকপতি নামক এক চুয়াড় নায়কের নেতৃত্বে প্রায় চারশ বিদ্রোহীর একটি বাহিনী হুগলী জেলার চন্দ্রকোণা পরগণার উপর আক্রমণ করে। ১৭৯৯ খ্রিঃ মধ্যে জঙ্গলমহলে অর্থাৎ যে সকল অঞ্চলে পাইক ও চুয়াড়দের নিকট থেকে শাসকগণ জমি-জমা কেড়ে নিয়েছিল, সে অঞ্চলের রাজস্ব সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। চুয়াড় বিদ্রোহীরা জানত যে, উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে স্মমুখ যুদ্ধে জয়লাভের আশা তাদের নেই। তাই তারা এইরুপ ব্যবস্থা করে যাতে বিস্তীর্ণ মেদিনীপুর জেলার দূরবর্তী মফঃস্বল অঞ্চলে কোন সরকারী বাহিনী এসে কোন জমিদার, বানিয়া অথবা তহশীলদার ও ইজারাদারদের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করতে না পারে। তাহলে খাদ্যের অভাবেই সরকারী বাহিনীকে পালাতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা জেলার সকল জমিদার, তহশীলদার, ইজারাদার ও বিশেষত বানিয়াদের চিঠি দিয়ে সতর্ক করে দেয় যে, যদি কেউ ইংরেজ পক্ষের সৈন্যদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। বিদ্রোহীরা একে রানী শিরোমণির নির্দেশ বলে প্রচার করে। রানী শিরোমণী ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম জমিদারীর মালিক এবং এই বিদ্রোহের নেত্রী। বিদ্রোহে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে মেদিনীপুরের লক্ষ্মীবাঙ্গ বলা হয়। বিদ্রোহী চুয়াড়রা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ইওংরেজ পুলিশ বাহিনী বিদ্রোহীদের উপর তীব্র দমন পীড়ন চালায় এবং রানী শিরোমণিকে হত্যা করে। বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলী এবং বাংলার গভর্নর জেনারেল কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন। এই সময় ইংরেজরা চাষিদের ধূমায়িত ক্ষোভ মোকাবিলার জন্য একদল রাজনৈতিক মিত্র পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব চিলেন। ইংরেজরা মনে করেছিলেন এর মাধ্যমে সৃষ্ট জমিদাররা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে কোম্পানীর স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। তৃতীয়ত, কর্ণওয়ালিস সহ অন্যান্য ইংরেজরা অনেকেই মনে করেছিলেন যে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করলে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া সরল ও সস্তা হবে।

বাংলার জমিদাররাও খুশিমনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই বন্দোবস্ত প্রচলনের পরেই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধায় ফেলেছে। ১৭৯৪ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের বিশেষ দাম বাড়েনি। সম্ভবত সার্বাধিক সংখ্যক জমিদারী বিক্রির ঘটনা এই সময় ঘটেছিল।পুরোনো জমিদাররা কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যস্ত আইন অনুযায়ী তাদের জমি নিলাম হত এবং অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে দেখা যায় যে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী জমিদার পরিবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানীকে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় তাদের জমিদারী হস্তান্তরিত হয়। এই ধরনের জমিদারীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশাহি, দিনাজপুর, নদিয়া, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বড় ও ঐতিহ্যশালী জমিদারিগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারি নিজের হাতে রাখার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বড় জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায়ের জন্য তাদের জমিদারি ভাগ করে দিতেন । এইভাবে বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারের উদ্ভব হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় পত্তনি ব্যবস্থা। পত্তনি ব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরুপণ করতে গিয়ে H.H.Wilson বলেছেন---এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পত্তনিদাররা জমিদারীর যে অংশটুকু লাভ করবেন, সেই অংশের ওপর তাঁর চিরকালীন এবং বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি যদি সময়মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিয়ে যান তবে তাঁর পত্তনি তালুকে জমিদার কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে জমিদার পুরোনো মধ্যবর্তী জমিদারের জায়গায় নতুন লোক বসাবেন। তাঁর হাতে জমি বিক্রি করা বা রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁরও অধীনস্থ পত্তনিদার বা ইজারাদার বসানোর পূর্ণ অধিকার থাকবে। কিন্তু সে সময় তাঁকে জমিদারের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা দিতে হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে যে পত্তনি ব্যবস্থার সূচনা করেছিল তাঁর প্রভাব ছিল সূদূরপ্রসারী। প্রথমত, বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ও প্রজার মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদাররা পত্তনিদার, ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে যেতেন এবং সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের (absentee landlord) সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এই অনুপস্থিত জমিদার ক্রমেই কৃষকের উন্নতিসাধন বা কৃষকের স্বার্থরক্ষার

বিষয়ে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, পত্তনি ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর রায়তের ওপর খাজনার বোঝা মারাত্মক আকারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপস্বত্বভোগী পত্তনিদার, তালুকদার, ইজারাদার বা জোতদারদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—কিভাবে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ বাড়ানো যায়। তাই কৃষির উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে তারা খাজনা আদায়ের জন্য রায়তদের ওপর চরম অত্যাচার চালাত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বাজারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারি অর্থনীতির অনুপ্রবেশ ও কৃষির বাণিজ্যিকরণ। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যিকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমত শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছিল। উদাহরণস্বরুপ বর্ধমান ও নদসিয়ার চাষিরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলার কৃষকশ্রেণী। এই বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানী সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, সেরকম কোন চুক্তিতে কিন্তু জমিদারেরা রায়তদের সঙ্গে আবদ্ধ হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করত। বর্ধিত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর অত্যাচার চালানো হত। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নং রেগুলেশনে বলা হল—খাজনা দিতে ব্যার্থ রায়তকে জমিদার ইচ্ছেমতো জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইনকে রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করেছিল। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতের ''প্রথম কালা কানুন"।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এক নতুন রাজনৈতিক মিত্র লাভ করেছিল। রজনী পাম দত্ত তাঁর India Today নামক গ্রন্থে বলেছেন, গণ-বিক্ষোভের আঘাত থেকে ইংরেজ শাসনকে রক্ষার জন্য এই রাজনৈতিক মিত্রতার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ধরণের মতামতের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেছেন অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরি। তিনি বলেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলনের সময় কোম্পানির সামনে গণ বিক্ষোভ জনিত কোনো বিপদের অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু সুপ্রকাশ রায় তাঁর ''ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে—ক্রমবর্ধমান গণবিদ্রোহের আঘাত থেকে এক নবপ্রতিষ্ঠিত বৈদেশিক শাসনকে রক্ষার করার জন্য ও একদল কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন সমর্থক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিজেদের কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার জমিদার শ্রেণীর হাতে অর্পণ করেছিল। বদরুদ্দিন উমর সুপ্রকাশ রায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করে লিখেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ভারতীয় জমিদারদের এক কৃষক বিদ্রোহ বিরোধী জোট গড়ে উঠেছিল। বিখাত পন্ডিত অশোক মিত্র ভারতের Census লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভারতকে একটি কৃষিনির্ভর দেশ হিসাবে রেখে দিতে চেয়েছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকে অবহেলা করার প্রবণতা এই বন্দোবস্তে ছিল। ইংরেজ শাসকেরা বুঝেছিলেন যে শিল্প ও বাণিজ্য পশ্চাদপদ ভারতের বাজারে এর ফলে ইংল্যান্ড থেকে শিল্পজাত পণ্য আমদানী করা অনেক সহজ হবে।

৫) তুমি কি মনে কর ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটেছিল?

- ইংরেজ বণিকদের দ্বারা ভারতের শিল্পজাত পণ্যের পরিবর্তে কৃষিজাত কাঁচামাল ব্রিটেনে রপ্তানি করা ও ব্রিটেন থেকে সেখানকার শিল্পজাত তৈরি পণ্য ভারতে আমদানি করার নীতিই ভারতে প্রথম পর্যায়ের অবশিল্পায়নের সূচনা করেছিল। সাধারণভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকেরা অবশিল্পায়ন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিদরা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে অবশিল্পায়ন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে রজনী পাম দত্ত, গ্যাডগিল, সারদা রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসেকেরাও মোটামুটি একই কথা বলেছেন। অনেকে আবার অবশিল্পায়ন কথাটির পরিবর্তে বিশিল্পায়ন বা শিল্প বিনাশন শব্দগুলি ব্যবহাত্র করার পক্ষে। অবশিল্পায়ন কথাটির সংজ্ঞা নিরুপণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন—''শিল্পায়নের লক্ষণ হল কৃষিকাজ থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন অংশ বাড়ে, শিল্পকর্মে নিয়োজিত জনসংখ্যা কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিপরীত যদি হয় অর্থাৎ যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে চাষ-আবাদে জীবিকা অর্জন শুরু করে, অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে এবং শিল্পজ অংশ কমতে থাকে তাকে অবশিল্পায়ন (de-industrialisation) বলে।

  ঐতিহাসিকেরা ভারতে অবশিল্পায়নের বিবিধ কারণ উল্লেখ করেছেন। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশিল্পায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলায় এক বিশৃঙ্খল পরিস্থির সৃষ্টি করে। এই অরাজক অবস্থা অবশিল্পায়নের একটি কারণ। কিন্তু হরিরঞ্জন ঘোষাল তাঁর "Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833'' এবং সারদা রাজু তাঁর ''Economic Conditions in Madras Presidency" গ্রন্থে এই বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। এরা দুজনেই সাময়িক বিপর্যয় ও দীর্ঘকালীন অবক্ষয়ের মধ্যে পার্থক্য টেনে বলেছেন যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সুতিবস্ত্র শিল্পের সাময়িক ক্ষতি করলেও স্থায়ী অবক্ষয় ঘটায়নি। ডি.আর.গ্যাডগিল বলেছেন—অষ্টাদশ শতকে রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে রাজা-মহারাজারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের দরফবারে শৌখিন বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পাবার জন্য অবশিল্পায়ন হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বিরোধীতা করে বলেছেন দরবারি চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য সাময়িক অসুবিধা হলেও স্থায়ী কোনো বিপর্যয় শিল্পের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

  ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ভালোভাবে সংঘটিত হবার আগে পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পয়ানী ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করে মুনাফা তুলত। কিন্তু ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার লুপ্ত হবার পর এবং তথাকথিত অবাধ বাণিজ্যনীতি গৃহীত হবার পরই ভারতে অবশিল্পায়ন ঘটতে আরম্ভ করে। এই সময় দুটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়—প্রথমত, ভারতের কুটির শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হ্রাস করে কেবলমাত্র কাঁচামাল ইংল্যান্ডে পাঠানো আরম্ভ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের মিলের কাপড়ের আমদানি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একদিকে এদেশ থেকে কাঁচামাল পাঠিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে ইংল্যান্ডের মিলে তৈরী সস্তা কাপড়ে এদেশের বাজার ভরিয়ে ফেলা হল। বিলিতি কাপড়ের অনুপ্রবেশের পথ প্রশস্ত করার জন্য অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে আমদানিকৃত মিলের কাপড়ের ওপর শুল্ক কমিয়ে দেওয়া

হল। ১৮১৫ সালে একটি আইনে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্রের ওপর মাত্র ২ ১/২ শতাংশ আমদানী শুল্ক ধার্য করা হয়। কিন্তু ভারতীয় শিল্পপণ্যের চাহিদা ইংল্যান্ডের বাজারে হ্রাস করার জন্য ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের ওপর ইংল্যান্ডে চড়াহারে আমদানি শুল্ক বসানো হয়েছিল। ১৮১৩ সালে বাংলার মসলিনের ওপর ৪৪% এবং ক্যালিকো ও ডিমিটি কাপড়ের ওপর ৮৫% আমদানি শুল্ক ইংল্যান্ডের সরকার ধার্য করে। ফলে ভারতের বাজার বিদেশী বস্ত্রে ছেয়ে যায় এবং ভারতের তাঁতশিল্পে এক অভূতপূর্ব বিপর্যয় দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তাঁতি ও কারিগরেরা তিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রথমত, ইংল্যান্ডের কারখানাগুলি কাঁচামালের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে এখান থেকে কাঁচামাল রপ্তানি করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে ভারতের তাঁতি ও কারিগরেরা কাঁচামালের অভাব অনুভব করেছিল। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের তৈরী সস্তা মিলের কাপড় এত বেশি পরিমাণে আসতে থাকে যে দেশিয় তাঁতিরা তাদের বাজার হারায়। তৃতীয়ত, চড়া শুল্কের ফলে ব্রিটেনের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। কেবল ব্রিটেন নয়, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের বাজারও বাংলার কারিগরেরা হারিয়েছিল। ইংরেজ শাসক তার রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া ও বৃহত্তম বাজারে পরিণত করতে চেয়েছিল। তাই রমেশচন্দ্র দত্ত ও রানাডে থেকে শুরু করে রজনীপাম দত্ত, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, অমিয় বাগচী প্রমুখ ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদেরা সকলেই বলেছেন উনবিংশ শতকে ভারতের কুটিরশিল্পের অবলুপ্তির বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের অভিঘাত।

কর্মচ্যুত এইসব তন্তুবায় শিল্পী ও কারিগরদের সামনে সবথেকে বড় সমস্যা এল বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাব। অধিকাংশই তাদের ঐতিহ্যগত পেশা হারিয়ে কৃষিকাজে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। কিন্ত এর ফলে কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণভাবে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বাড়তে থাকে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ভারতীয় জনসংখ্যার ৮০% এবং গণেশ বাসুদেব জোশির মতে ৮৬% কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অনেক তাঁতশিল্পী আবার খেতমজুর বা কুলির কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। চিরাচরিত, ঐতিহ্যগত পেশা নষ্ট হয়ে গেল অথচ নতুন কর্মসংস্থানকারী আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠল না—এটাই ছিল হস্তশিল্পীদের ওপর অবশিল্পায়নের দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া।

তবে সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশিল্পায়ন নিয়ে এক বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিতর্কের মূল বিষয়—ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাবে উনিশ শতকে ভারতে অবশিল্পায়ন আদৌ হয়েছিল কিনা? মার্কিন গবেষক Morris D. Morris মনে করেন ‘‘অবশিল্পায়ন’’ বিষয়টি একটি কল্পকাহিনী (myth) মাত্র। ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা অহেতুক বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসে কখনোই এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও অবশিল্পায়ন ঘটেনি। Morris-এর মতে, ভারতের ঐতিহাসিকেরা শিল্পদ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন ভেবেছেন। প্রথমত, যদি জনসাংখ্যা ও জাতীয় আয় বাড়ে তবে দেশীয় শিল্প অক্ষত রইল এবং আমদানি বাড়ল এমনও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পদ্রব্যের আমদানির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনবিংশ শতকে সুতো আমদানি করার ফলে ভারতের সুতো কাটুনিরা মার খেল কিন্তু তাঁতিরা সস্তা সুতোয় সস্তা কাপড় তৈরি করতে পেরেছিল এবং সস্তা বিলিতি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পেরেছিল। তৃতীয়ত, কুটির শিল্পজাত পণ্যের নিজস্ব বাজার ছিল। দামি শাড়ি যা মিলে তৈরি হত না বা পাটের শাড়ি, যা ধর্মীয় কাজে ব্যাবহৃত হত প্রভৃতির বাজার অক্ষুন্ন ছিল কারন এর বিদেশি প্রতিযোগিতা ছিল না। এইসব যুক্তি Morris দেখিয়ে বলেছেন উনিশ সতকে ভারতে অবশিল্পায়ন হয়নি বরং আর্থিক উন্নয়নই

ছিল এই সময়ের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু একাধিক ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করেছেন। জাপানি ঐতিহাসিক তরু মাৎসুই ১৯৬৮ সালে একটি লিখিত প্রবন্ধে যথেষ্ঠ তথ্য সহকারে মরিসের যুক্তি খন্ডন করে দেখিয়েছেন—উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁতিদের সংখ্যা কমে যায় এবং তাদের অবস্থারও উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়। তাছাড়া তরু মাৎসুই ও বিপান চন্দ্র সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে পরিমান সুতো আমদানি করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি কাপড় এদেশে এসেছিল। তাছাড়া বিলিতি কাপড় এদেশের বাজার দখল করার বেশ পড়ে সুতো আমদানি শুরু হয়। ততদিনে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতে ভারতের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়েছিল। সুতরাং সস্তায় সুতো আমদানি করার ফলে ভারতীয় তাঁতিরা তাদের তৈরী বস্ত্রের পসরা নিয়ে ব্রিটেনের মিলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ পেয়েছিল মরিসের এই বক্তব্য একেবারেই সঠিক নয়। অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচী পরিসংখ্যানগত তথ্যের ভিত্তিতে দেখিয়েছেন ১৮০৯-১৩ সাল থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভরশীল কারিগরদের সংখ্যা মারাত্মক হারে হ্রাস পেয়েছিল। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মরিসের যুক্তির ''গোড়ায় গলদ" দেখিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—"প্রমাণ কোথায় যে জনসংখ্যা ও মাথাপিছু গড় জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে উনিশ শতকে বাজারের আয়তন বাড়ায়, আমদানি ও দিশি শিল্পদ্রব্য দুটিরই জায়গা ছিল, দিশি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি??"

উপরে উল্লেখিত তথ্য ও ঐতিহাসিকদের আলোচনার ভিত্তিতে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে উনিশ শতকে ভারতের ইতিহাসে অবশিল্পায়ন ছিল একটি বাস্তব সত্য এবং ঔপনিবেশিক শাসন এই অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে ভারতের অর্থনীতির পশ্চাদবর্তিতার সূচনা করেছিল।

৬) ঔপনিবেশিক যুগে কৃষির বাণিজ্যকিকরণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ?

- কৃষির বাণিজ্যিকরণ বলতে কেবলমাত্র কৃষিজ উৎপাদনের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হওয়া বা নগদ টাকার জন্য কৃষিজ উৎপাদনকে বোঝায় না। প্রাক-ব্রিটিশ যুগেও চাষের ফসলের বাজার ছিল। কিন্তু তার জন্য ভারতীয় কৃষিতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আসেনি। বাণিজ্যকরণ কথাটি আরও অনেক বেশি অর্থবহ। বাণিজ্যকরণ বলতে বোঝায় কৃষকের স্বেচ্ছায় বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া, জমির বাজার ও কৃষিপণ্যের বাজারের বিকাশ ও কৃষিপণ্যের স্তরবিন্যাস। এসবেরই পরিণতি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের কৃষিতে যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলি এনেছিল তার ফলে ঐতিহ্যগত গন্ডিবদ্ধ সম্পত্তির অধিকার পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যগত অপ্রতিহত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রুপান্তরিত করেছিল। এই নতুন অধিকারের দ্বারা লাভবান ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক তারতম্য ছিল। সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাহিদা এবং খাজনা বৃদ্ধির বিষয়ে জমিদারদের ওপর আইনি নিয়ন্ত্রণের অভাব কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ করে তুলেছিল।

  ব্রিটিশ আমলে রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা কৃষকদের বাজারমুখী করে তোলে। রাজস্ব ও খাজনার চাহিদা মেটাতে হত নগদ টাকায়। অথচ কৃষকের কাছে নগদ টাকার ঘাটতি ছিল। তাই পণ্যের বাণিজ্যের প্রয়োজন দেখা দিল। তাছাড়া বীজ, কৃষি সরঞ্জাম, গবাদি পশু ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষকদের প্রায়ই ঋণ নিতে হত। হুইটকোম্ব এবং শাহিদ আমীন দেখিয়েছেন, বাধ্যতামূলকভাবে নগদ টাকায় রাজস্ব বা খাজনা দেওয়ার জন্য কৃষকরা প্রায়ই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তেন। খাজনা মেটানো ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ কৃষকদের জবরদস্তিমূলক বাণিজ্যিকরণের(Forced Commercialisation) দিকে নিয়ে যায়। খাদ্যশস্যের

অনুপাতে অর্থকারী শস্যের আবাদ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য শস্যের ফলন কমে যায়। আবহাওয়া, জমির বিশেষত্ব অনুযায়ী ভারতের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরণের অর্থকারী শস্যের চাষ শুরু হয়। ব্রিটিশ আইন জমিকে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং জমি বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়। এই নতুন বিকাশ চাষিদের অর্থকারী শস্য ফলানোর প্রতি মনোযোগী করে তোলে।

পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের অনগ্রসর এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ধরণের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিতে বাণিজ্যিকরণ শুরু হয়েছিল। এই চাপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত চাহিদা, স্বল্প বৃষ্টিপাতের দরুন ফসলের অনিশ্চয়তা, অনুর্বর জমি ও অনুন্নত সেচ ব্যবস্থা। বাণিজ্য ও মহাজনি কারবার সন্মিলিতভাবে এই অঞ্চলে দাদনি ব্যবস্থার মতো একটি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটায়। কিন্তু মধ্য পাঞ্জাবের অবস্থা এরকম ছিল না, কারণ এই অঞ্চল ছিল অপেক্ষাকৃত উর্বর। উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থার জন্য এখানে তুলো ও আখের ভালো ফলন হত। তুলো ও আখ চাষের জন্য বীজ, সার, শ্রম ও সেচ বাবদ যথেষ্ঠ পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হত। তাই চাষীরা এই বিনিয়োগের বিনিময়ে ভালো ফলন আশা করতেন। চাষীরা গ্রামীণ ব্যবসায়ীদের কাছে কাঁচা তুলো বিক্রি করতেন। এদের কাছ থেকেও অনেক সময় চাষীরা চাষের জন্য ঋণ নিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে পাঞ্জাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন খাদ্যশসু উৎপাদনকারী কৃষকরা। ফলনের সময় এই ব্যবসায়ী মহাজনেরা ঘাটতি উৎপাদনকারী চাষীদের কাছ থেকে সস্তায় গম কিনে নিতেন। আবার ব্যবসায়ীরা চাষিদের ভোগের জন্য তাদের কাছেই চড়া দামে গম পরে বিক্রি করতেন। খাদ্যশস্য কিনতে গিয়ে চাষিদের হাতে আর পয়সা থাকত না। তখন বীজ ও অন্যন্য কৃষিসরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যবসায়ীরা চাষিদের অগ্রিম ঋণ দিতেন। উৎপাদকদের ওপর ব্যবসায়ী মহাজনদের এই আধিপত্য ও তাদের কাছে উৎপাদকদের ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার পরিণতি হিসাবে জমি ক্রমশ কৃষকদের কাছে হাতছাড়া হতে থাকে। জমির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক রেখে সেই জমিতেই ভাড়াটে চাষি হিসাবে কাজ করতেন। যদিও জমি বিক্রির ফলে কৃষকদের জমিচ্যুত হওয়ার ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি কিন্তু বন্ধক রাখার ফলে কৃষকরা জমির প্রকৃত অধিকার হারায়। উত্তর ও মধ্য ভারতে নগদ টাকায় রাজস্ব দাবি করা হয়েছিল। এই রাজস্ব চাহিদা ছিল অয়ন্ত বেশি এবং ২০ থেকে ৩০ বছরের জন্য এই রাজস্ব ধার্য করা হত। রাজস্ব চাহিদার বৃদ্ধি চাষিদের নীল, আখ, গম ইত্যাদি পণ্যের ফলনে বাধ্য করেছিল। এরিক স্টোকস স্বীকার করেছেন—এই অঞ্চলে কৃষির বাণিজ্যকরণ ছিল কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক রাজস্ব বৃদ্ধি ও মহাজনের চাপের পরিণতি।

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ১৭৯৩ খিঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। ১৭৯৯, ১৮১২ এবং ১৮১৯ খ্রিঃ আইনগুলির মাধ্যমে জমিদারদের কৃষকদের ওপর খাজনার হার বাড়াতে অসুবিধা হয়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজস্ব জমা করা, খাজনা দেওয়া এবং যাবতীয় লেনদেন নগদ টাকার মাধ্যমে করার নীতি প্রচলিত হয়। ফলে অর্থের বাজারের দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং ঋণের জাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র টাকার একরুপী প্রচলনের প্রসার ঘটে। একজন ছোটো কৃষক উৎপাদনকারীর কাছে তার চাষের জমি সুরক্ষিত রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়মতো খাজনা দেওয়া। না হলে সে তার জমি বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। ফলে বিনিময় বসম্পর্কের ক্রমবিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং এই বিষয়টি নির্ধারিত করে দিত চাষি কী ধরণের ফসল ফলাবে। একজন ছোট চাষি তার জমিতে যে ধরণের শ্রম দিত প্রতিদানে মূল্য পেত অনেকটাই কম। চার্লস গ্রান্ত লক্ষ করেছিলেন চাষিরা চাষের জন্য মহাজনদের সাহায্য নিতেন এবং বীজ বপনের আগে শস্য বন্ধক রাখতে বাধ্য হতেন। অমিত ভাদুড়ি মনে করেন, ঋণের জাল কৃষকদের এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে

ফেলেছিল যে, তাদের কাছে ধানের মতো খাদ্যশস্যের সঙ্গে পাটের মতো বাণিজ্যিক শস্যের কার্যত কোনো তফাৎ ছিল না, যদিও আপাতভাবে কৃষির বাণিজ্যকরণের ক্ষেত্রে পাটের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। মহাজন ও বণিকরাই ঠিক করে দিতেন যে, চাষি কি ধরণের ফসল ফলাবেন। এই মহাজন ও বণিকরাই ছিল বাজার ও বাজারি উদ্‌বৃত্তের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। বাংলায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানের চাল চাষিরা দায়ে পড়ে বিক্রি করতেন এবং সেগুলি বণিকরা অন্যত্র চালান করে দিতেন। দামের তারতম্যের জন্য চাষিরা লাভবান হতেন না। পুরো লাভটাই ঘরে তুলত বণিকরা। অথচ ছোট চাষিরা অনিচ্ছায় বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তেন।

সবশেষে বলা যায় ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকরণের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক উপকৃত হয়নি। এই বাণিজ্যকরণের ইউরোপের ন্যায় ভারতীয় গ্রামীন সমাজে কোন পুঁজিপতি কৃষক ও সর্বহারা শ্রেণীরও উদ্ভব হয়নি বা কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়নি। কৃষি উৎপাদনশীলতাও জনসংখ্যার তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি যার ফল ছিল মাঝে মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে হয়ে চলা দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকট।

৭) মহাবিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ১৮৫৭ সালের ১১ মে দিল্লীর পতন এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা ভারতের বিভিন্ন স্থানের সিপাহী ও জনসাধারণকে ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের ব্যাপয়ারে উৎসাহিত করে তুলেছিল। যেরকম বিদুৎগতিতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তার থেকে একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে এই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে একটা সংগঠিত প্রয়াস ছিল। বিদ্রোহের আগে সিপাহীদের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে লাল পদ্মফুল ও চাপাটি(রুটি) পাঠানো হয়েছিল।

  রুদ্রাংশু মুখার্জি তাঁর “Awadh in Revolt: 1857-58” নামে সাম্প্রতিক গ্রন্থে বলেছেন— গুজব, ভীতি এবং আতঙ্ক সিপাহীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং সহিংস আন্দোলনে প্ররোচিত করেছিল। এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা আছে। তবে বহুকাল ধরে অর্জিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই সিপাহীদের মধ্যে এই ধরনের মানসিকতার জন্ম দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ৩০ জুন চিনহাটের যুদ্ধের মাধ্যমে বির্জিস কাদেরকে লক্ষ্ণৌ-এর রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। উক্ত ঘোষণাপত্রে বিদ্রোহের কারণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে—একটি বিদেশী সরকারের অধীনে ভারতীয়দের ধর্ম, মর্যাদা, জীবন ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয়েছে। ১৮৫৭ সালের ২৫ শে আগস্ত সম্রাট বাহাদুর শাহ “আজমগড় ঘোষণাপত্র” নামে অপর একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন। এই ঘোষণাপত্রে ভারতীয়দের তীব্র আসন্তোষের পেছনে ধর্মীয় কারণের ওপর সার্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল— ইংরেজ শাসকদের কতকগুলি কু-মতলব আছে। তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সমস্ত সিপাহিদের ধর্ম ধ্বংস করা এবং তারপর হিন্দুস্থানের যাবতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই ঘোষণাপত্রে আসলে সিপাহিদের বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছিল, যাঁরা মনে করেছিলেন একমাত্র ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস করতে পারলেই তাঁরা খ্রিস্টধর্মে ব্যাপক হারে ধর্মান্তরিত হবার আশঙ্কা ও বিপদ থেকে মুক্ত হবেন।

  সাধারণত বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং তা নিয়ে যথেষ্ঠ বিতর্ক হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে এনফিল্ড রাইফেলে এক বিশেষ ধরণের কার্তুজ ব্যবহৃত হত যার টোটা শুয়োর অথবা ষাঁড়ের মাংস দিয়ে তৈরী। প্রধান

সেনানায়ক এনসন ১৮৫৭ সালের ২৩ মার্য ক্যানিংকে লিখিত একটি চিঠিতে এই টোটোর ব্যাপারে সিপাহীদের ক্ষোভের কথা স্বীকার করেছিলেন। ম্যালেসন লিখেছিলেন—কার্তুজের বিষয়টি ছিল একটি ঘটনামাত্র, যাবারুদে অগ্নিসংযোগ করেছিল। সি. বল অবশ্য বিদ্রোহের আসল কারণ হিসাবে কার্তুজের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে এই কার্তুজ বিদ্রোহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিল। বাহাদুর শাহের বিচারের সময় সরকারি উকিলও বলেছিলেন—দিল্লী ও মিরাটে ইংরেজদের হত্যা করার সময় বিদ্রোহীরা এই কার্তুজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছিল।

বিদ্রোহের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সিপাহিদের স্বল্প বেতন এবং তাদের পদন্নোতির সূযোগের অভাব। একটি পরিসংখ্যান থেকেই ভারতীয় সিপাহিদের স্বল্প বেতনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতে নিযুক্ত কোম্পানীর সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ১৬.২ শতাংশ ছিল ইউরোপীয়। অথচ তাদের পেছনেই কোম্পানী সৈন্যদের দেওয়া সমগ্র বেতনের ৫৭.৮ শতাংশ ব্যয় করত। বেতনের এই বৈষম্য স্বাভাবিকভাবেই সিপাহিদের ক্ষুব্ধ করেছিল। টমাস মনরোর লেখা থেকে জানা যায় যে একজন ভারতীয় সিপাহি বড়োজোর সুবাদার পদ পর্যন্ত উন্নীত হতে পারতেন, আর এই পদের স্থান ছিল সর্বনিম্ন ইউরোপীয় অফিসারের অনেক নীচে। তাছাড়া সিপাহিরা প্রায়ই ইংরেজদের দুর্ব্যবহারের শিকার হত। ইংরেজরা তাদের অকথ্য গালিগালাজ করত এবং অপমান করত। শুধু সিপাহিরা কেন, সমস্ত ভারতীয়দের ওপরই ইংরেজদের জাত্যভিমানজনিত রোষ ও অসম্মান বর্ষিত হত। এমনকি অভিজাতশ্রেণির মানুষেরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নূন্যতম মর্যাদা এদের প্রতিও ইংরেজ শাসকেরা প্রদর্শন করেনি। ফলে সাধারণ সিপাহি থেকে শুরু করফে সাধারণ মানুষ সকলেরই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছিল।

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতির নগ্ন প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল তাঁর স্বত্ববিল্প নীতির মধ্যে। এই নীতির সাহায্যে ডালহৌসি একের পর এক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে দেশীয় রাজন্যবর্গের কোপানলে পড়েছিলেন। বঞ্চিত ও বিতাড়িত রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাপটে নিজেদের অসহায় মনে করতে শুরু করেছিলেন। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে সাতরা, ঝাঁসি, তাঞ্জোর ব্রিটিশ সাম্রজ্যভুক্ত হয়। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে ডালহৌসি চূড়ান্ত নীতিহীনতার পরিচয় দিয়ে নাগপুর দখল করেন। ১৮৫৪ সালে কর্ণাটকের নবাব পদ অবলুপ্ত হয়। নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সবচেয়ে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কোম্পানী কর্তৃক অযোধ্যা দখল। ১৮৫৬ সালে ডালহৌসি অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অযোধ্যা দখলের সময় যে আর্মির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ 'বেঙ্গল আর্মি'র অধিকাংশ সৈন্যই নিয়োগ করা হয়েছিল অযোধ্যার গ্রামাঞ্চল থেকে। তারা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের অযোধ্যা দখল ভালোচোখে দেখেনি। তার অপর আযোধ্যায় এক অত্যন্ত কঠোর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন সিপাহি তথা সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করেছিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ফলে জনসাধারণের অসন্তোষ ও ক্ষোভ। ঔপনিবেশিক শোষণ ও লুন্ঠনের ফলে ভারতীয়দের জীবনে চরম দারিদ্র নেমে এসেছিল। চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী—সমস্ত ভূমিব্যবস্থাই কৃষকদের ওপর খাজনার মারাত্মক বোঝা চাপিয়েছিল। খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকরা সরকার ও জমিদারদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে ঋণ নিতে বাধ্য হত। এই ঋণের বোঝা তাদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছিল। তার উপর উত্তর ভারতের ভূমিব্যবস্থার ফলে সেখানকার রায়তেরা জমির ওপর তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার হারিয়েছিল। ঐতিহাসিক এরিক স্টোকস বলেছেন—যমুনা নদীর

তীরবর্তী এলাকায় এবং গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী রাজপুতেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, কারণ তারা সেখানকার নিষ্ঠুর ও দমনমূলক ভূমিব্যবস্থা মেনে নিতে পারেননি। স্টোকস আরও বলেছেন—পশুচারণের জন্য রক্ষিত বংশানুক্রমিক জমিগুলি হাতছাড়া হবার ফলে হরিয়ানা ও উচ্চ দোয়াব অঞ্চলের পশুচারণকারী গুর্জরেরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল।

কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক সি . এ. বেইলি তাঁর "The Indian Society and the Making of the British Empire" নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তদানীন্তন বেশ কিছু "প্রান্তিক গোষ্ঠী"-র অসন্তোষের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভাট্টি রাজপুত, গুর্জর, পাশি, বাঞ্জারা প্রভৃতি পশুচারণকারী আধা-যাযাবর গোষ্ঠীর বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন। ফরাসি বিপ্লবের সময় "Great Fear" যেমন রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে দিশাহারা করে তুলেছিল, এই বিদ্রোহের সময়ও সেরকম বনাঞ্চলগুলিতে এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ব্যাপক লুন্ঠন চালানোস অংক্রান্ত গুজব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল। বেইলির মতে—এই প্রান্তিক গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রথম অসামরিক ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। যদিও বেইলি মহাবিদ্রোহের মূল কারণ হিসাবে জনগণের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে স্বীকার করেননি, কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যাবেনা যে অসম্ভব দারিদ্রই উপরোক্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীর লোকেদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

৮) মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র নিরূপণ করতে গিয়ে সমসাময়িক ইংরেজ আমলা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক তীব্র বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কের সূত্রপাত ১৮৫৮ সালে। জে. বি. নর্টন লিখেছিলেন—এটি একটি সামান্য সিপাহি বিদ্রোহ ছিলনা; এই অভ্যুত্থান একটি গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু আর এক সমসাময়িক ইংরেজ চার্লস রেইকস তাঁর "Notes on the Revolt in Northern Western Province of India"-তে বলেছিলেন—এটা ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ। ব্রিটিশ কর্তৃত্ব শিথিল হবার ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডাফ, কায়ে, বল, ম্যালেসন অবশ্য নর্টনের বক্তব্যের সমর্থক এবং তাঁরা সকলেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার একটি সংগঠিত প্রয়াস হিসাবে দেখেছেন। পরবর্তীকালে বেশকিছু ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সহকারে এই বক্যব্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছেন। আবার রেইকস উত্থাপিত দ্বিতীয় মতটির সমর্থকও প্রচুর। কিন্তু এই বিদ্রোহের শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই বিতর্ক চলছে। পরবর্তীকালের প্রচুর ঐতিহাসিক তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও এই দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করেছেন।

  ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্যার জন লরেন্স এবং সিলি এই বিদ্রোহকে "দেশদ্রোহী ও স্বার্থপর" সিপাহিদের বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে এই বিদ্রোহের পেছনে কোনো সংগঠিত নেতৃত্ব বা জনসমর্থন ছিল না। এল. ই. আর. রিস এই বিদ্রোহকে ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানদের খ্রিস্টধর্ম-বিরোধী জেহাদ হিসাবে দেখেছেন। ইংরেজ লেখক ট. আর. হোমসের মতে—এই বিদ্রোহে সভ্যতা বনাম বর্বতার সংঘাত প্রকাশ পেয়েছিল।

আধুনিক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র মজুমদার জোরের সঙ্গে করেছেন এটি ছিল একটি সিপাহি বিদ্রোহ মাত্র। এই অভ্যুত্থানকে কোনোমতেই জাতীয় যুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম বা জাতীয় যুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে না। তাঁর মতে—একদল সিপাহি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ভারতীয় জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মানুষ এই বিদ্রোহে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি আরও বলেছেন—ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনার তখন "ভ্রূণাবস্থা"। সুতরাং সেখানে কোনো জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে না। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনও এই বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম হিসাবে মেনে নিতে নারাজ। তিনি বলেছেন—সিপাহিদের অভ্যুত্থানের সুযোগে একদল হতাশ সামন্তপ্রভু নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তাঁর মতে বিদ্রোহের পেছনে কোনো জাতীয় নেতৃত্বের বা জাতীয় স্তরে কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিল না এবং অভ্যুত্থানগুলি হয়েছিল বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে।

বীর সাভারকরও ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একতি জাতীয় যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণ করতে গিয়ে বিতর্কের উপর সম্পূর্ণ নতুনভাবে আলোকপাত করেছেন ঐতিহাসিক শশীভূষণ চৌধুরি। তিনি তাঁর Civil Rebellion in the Indian Mutinies গ্রন্থে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোশী জাতীয় যুদ্ধ বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি এটিকে একটি গণবিদ্রোহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। ১৮৫৭-৫৮ সাল জুড়ে সিপাহীদের বিদ্রোহ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে অসামরিক সাধারণ মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সেদিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং এই সংগ্রামের নেতারা " জাতীয়তাবাদের অচেতন যন্ত্র"।

কেম্‌ব্রিজ ঐতিহাসিক এরিক স্টোকস অবশ্য এই বিদ্রোহ জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একদল গ্রামীণ ভূস্বামী ও সামন্তপ্রভু এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁদের অনুরাগীরা তাঁদের অনুসরণ করেছিল মাত্র। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এই বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়নি। আর একজন কেম্‌ব্রিজ ঐতিহাসিক সি. এ. বেইলি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন—বিদ্রোহের সূচনাপর্ব থেকে অসামরিক মানুষের বিদ্রোহ এবং সিপাহিদের বিদ্রোহ একে অপরকে শক্তিশালী করেছিল। কারিগর, বিক্ষুব্ধ পুলিশ, দিনমজুর প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা ষুরে জনতা যে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল--একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। বেইলি আবার অন্যত্র বলেছেন যে বিদ্রোহীদের আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য কোনো সুসংবদ্ধ মতাদর্শ বা কর্মসূচী ছিল না। বিদ্রোহের ভিত্তি কোনোমতেই জাতীয়তাবাদ ছিলনা কারণ প্রান্তিক অথবা অবক্ষয়গ্রস্ত এলাকাগুলি থেকেই দীর্ঘ প্রতিরোধ উঠে এসেছিল।

এই মহাবিদ্রোহের প্রায় সমসাময়িককালে কার্ল মার্কস এই অভ্যুত্থান সম্পর্কিত প্রবন্ধে এটিকে "ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে মার্কসবাদী পন্ডিত রজনীপাম দত্তের লেখায় রমেশ্চন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন ও এরিক স্টোকসের বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনিও এই বিদ্রোহকে ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সামন্তপ্রভুদের নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে শেষ প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াস বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা বিশেষত তলমিজ খালদুন, সুপ্রকাশ রায় এবং প্রমোদ সেনগুপ্ত এই মহাবিদ্রোহকে ভারতীয় জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গৌরবময় সংগ্রামের কাহিনী হিসাবে দেখেছেন। সুপ্রকাশ

রায়ো বলেছেন—সিপাহিরা যখন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁদের আত্মীয়স্বজন যাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষি বা অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত ছিলেন বা পেশাচ্যুত হয়েছিলেন তাঁরাও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট স্থানীয় জমিদারত ও মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় বেশ কিছু ক্ষমতাচ্যুত সামন্তপ্রভু বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

সবশেষে বলা যায় এই বিদ্রোহ কোন অংশেই একটি জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম নয়। এই বিদ্রোহে একদিকে যেমন সিপাহি ও দেশীয় সামন্তবর্গ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তেমনি দেশের শোষিত কৃষক ও প্রান্তিকবর্গের মানুষরাও ব্রিটিশ ও দেশীয় সামন্তবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিদ্রোহের সূচনা হলেও শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী এই বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও গণবিদ্রোহ—উভয়েরই উপাদান এই বিদ্রোহে আমরা দেখতে পাই। তাই এই বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়।